“সঙ্কল্পে যে দৃঢ়, প্রতিজ্ঞায় যে অবিচলিত, যাবতীয় সিদ্ধি তার করতলগত। সঙ্কল্প ছাড়িব না, প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিব না, এই সার নীতি যার, সেই একমাত্র বিশ্বজয়ী হইতে পারে।”
যুগাচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ
প্রতিষ্ঠাতা, ভারত সেবাশ্রম সংঘ

মায়ের ডাক
MAYER DAK

www.mayerdak.com

“সত্যকে আজ হত্যা করে
অত্যাচারীর খাঁড়ায়
নেই কিরে কেউ সত্য সাধক
বুক খুলে আজ দাঁড়ায়”
—নজরুল

মাসিক বুলেটিন DL. No. 129/2000 E-mail : subhas.chkrbrty@rediffmail.com সেপ্টেম্বর ২০১১ মূল্যঃ ১ টাকা

ভারত ভূখণ্ড বাংলাদেশের দখলে?

নিঃ প্রঃ— র‍্যাড ক্লিফ ও মাউণ্ট ব্যাটেনের ভারত বিভাগ অনুসারে পূর্বপাকিস্তান বর্তমানে বাংলাদেশের পূর্বতন সিলেট (শ্রীহট্ট) জেলার, বর্তমান মৌলভী বাজার জেলার দক্ষিণ অংশের ১২টি থানার ১২৫৬ বর্গমাইল এলাকা ভারত ভূখণ্ডের অংশ বলে শোনা যাচ্ছে। থানাগুলি যথাক্রমে, মৌলভী বাজার, হবিগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, কমলগঞ্জ, কুলাউড়া, রাজনগর, লাক্ষাই, মাধবপুর, চুনারুঘাট, বাহুবল, বানিয়াচং ও নবীগঞ্জ। উক্ত এলাকা ধান, চা, চুন ও কাঠ সমৃদ্ধ বলে জানা যায়। উক্ত এলাকা বর্তমান মেঘালয় প্রদেশের প্রাপ্য।

১৯৫০ সালে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় মন্ত্রীসভার আইন মন্ত্রী, ব্যারিস্টার নীহারেন্দু দত্তমজুমদার ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর নিকট এ বিষয়ে একটি পত্র লেখেন। পণ্ডিত নেহেরু পত্র প্রাপ্তির পরও নীরব থাকায়, দিল্লী যেয়ে নীহারেন্দুবাবু প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রধানমন্ত্রীর ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করায়, ভারত সরকারের বিদেশ সচীব শ্রী পাইককে ডেকে পাঠান। দত্তমজুমদারের উপস্থিতিতে সরকারী ভাবে পাকিস্তান সরকারের নিকট পত্র লিখে ওই ১২ টি থানা ভারতের নিকট হস্তান্তরের দাবি জানানো হয়।

পরবর্তী সময়ে নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘের তরফ থেকে ভারত সরকারের সেক্রেটারী জেনারেলের নিকট একটি পত্র লিখে এ বিষয়ে দেশ বিভাগের প্রমাণ্য কাগজপত্র এবং মানচিত্র দাবি করা হয়। ভারত সরকার বিষয়টি সম্পর্কে উত্তর না দিয়ে, নীরব থেকেছেন। ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দল সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর এবং সীমান্ত চুক্তি নিয়ে যে তরজা বাক্য বিনিময় চলছে, তা র‍্যাডক্লিফের ভারত ভাগের মানচিত্র ও কাগজপত্র দেখলে ঝুলির ভিতরে লুকিয়ে রাখা রয়েল বেঙ্গল টাইগার বেড়িয়ে আসতে পারে।

এবার ইতালিতে বোরকা নিষিদ্ধ করা হচ্ছে

নিঃ প্রঃ— ইতালি এবার নারীদের জনসমক্ষে বোরকা, নেকাবসহ মুখ ঢাকে এমন পোশাক পরা নিষিদ্ধ করতে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে একটি খসড়া আইন অনুমোদন করেছে সে দেশের পার্লামেন্টের একটি কমিটি।

ওই খসড়া আইন পাসের জন্য গ্রীষ্মকালীন অবকাশ শেষে পার্লামেন্টে উপস্থাপন করা হবে। আইন পাসের পর কোনো নারী তা ভঙ্গ করলে তাঁকে ৩০০ ইউরো পর্যন্ত জরিমানা করা হবে। কোনো নারীকে জনসমক্ষে মুখ ঢেকে রাখতে অর্থাৎ নেকাব পরতে বাধ্য করলে শাস্তি হিসেবে ৩০ হাজার ইউরো জরিমানা ও এক বছরের কারাভোগ করতে হতে পারে।

এর আগে ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে বোরকা নিষিদ্ধ করা হয়।

এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ইতালিতে বর্তমানে প্রায় তিন হাজার নারী তাঁদের মুখ নেকাবে ঢেকে রাখেন। পাঁচ বছর আগেও দেশটিতে এ ধরনের চর্চা দেখা যায়নি।

ইতালির প্রধানমন্ত্রী মিনতিও বেরলুসকোনির নেতৃত্বাধীন ক্ষমতা-সীন দল এ আইনে সমর্থনজানালেও বিরোধী দল এর বিরোধিতা করে আসছে।

তবু কেন রাষ্ট্রধর্ম

সালাহউদ্দীন আহমদ * কবীর চৌধুরী, সরদার ফজলুল করিম, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আনিসুজ্জামান, কাইয়ুম চৌধুরী

বাংলাদেশের এক সামরিক শাসক নিজের ক্ষমতার ভিত্তি তৈরি করতে কাছে টেনেছিলেন মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধীদের। তিনি প্রধানমন্ত্রী করেছিলেন এমন একজনকে, যিনি ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে জাতিসংঘে গিয়েছিলেন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কথা বলতে। তিনি সামরিক ফরমান বলে দেশের সংবিধান

এরপর দুয়ের পাতায়

মুখে মিষ্ট অন্তরে বিষ ভরা। / সেই বন্ধুকে উচিত ত্যাগ করা।।—চাণক্য

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু উৎপীড়ন অব্যাহত

নিজস্ব বাংলাদেশ প্রতিনিধি প্রেরিত ঃ

● “হিন্দুরা আমাদের ভোট দেয় নাই” এই কথা বলে তাঁদের বাড়িতে হামলা চালিয়েছে স্থানীয় আওয়ামী লিগের মুসলিম সমর্থকরা। বাড়ি ঘর ভাংচুর, লুট ও পিটিয়ে আহত করা হয়েছে কয়েকজন সংখ্যালঘু নাগরিককে। ২ জুলাই ০১১, সন্ধ্যা সাতটায় এ ঘটনা ঘটেছে ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা উপজেলার ফুলসুতি ইউনিয়নের রামপাশা গ্রামে। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লিগের পরাজিত প্রার্থী সিরাজ খানের ৫০ জন সমর্থক দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালালে চিত্ত সাহা (৫৮), চঞ্চল সাহা (৩৬) ও শচীন কুমার সাহা (৫০) গুরুতর আহত হয়েছে। আনুমানিক ৬ লাখ টাকার সম্পদ লুণ্ঠিত হয়েছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় থানায় এ বিষয়ে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

● জোর করে তোলা আপত্তিকর ভিডিও চিত্র মোবাইল ফোণে ছড়িয়ে দেওয়ায় ক্ষোভ ও ঘৃণায় আত্মহত্যা করেছেন স্নাতক ছাত্রী ও হিন্দু গৃহবধু সুপর্ণা বালা (২২)। বরিশাল ব্রজমোহন বি এম কলেজের গণিত বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিলেন আত্মহননকারীনি। ভিডিও চিত্র ধারণকারী দুই মুসলিম দুর্বৃত্ত মোঃ নজরুল ইসলাম ও তার ভাই আবদুর রাজ্জাককে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। সুর্পনার বাড়ি খুলনা জেলার আশাশুনি উপজেলার লক্ষীখালী গ্রামে। গত ১৮ জুলাই ২০১১ বরিশাল শহরে কলেজ রো লেচু শাহ রোডে এ ঘটনা ঘটেছে।

● ১৫ জুলাই ২০১১, নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর উপজেলার মুছাপুর ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন (লাঙ্গলবন্ধ) মহাত্মা গান্ধী মন্দিরের পূজারী হিন্দু রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ছেলে বাবু চক্রবর্ত্তী প্রেম করে ভিন্ন বর্ণের একটি মেয়েকে আদালতের মাধ্যমে রেজেস্ট্রী বিবাহ করে। এলাকার মুসলিম দুর্বৃত্তরা ক্ষিপ্ত হয়ে এঘটনায় প্রহসন মূলক বিচার সভায় তিনশত লোকের সামনে বাবুর শরীরে ৩০ বার বেত্রাঘাত করে। এরপর বাবুর গোপন অঙ্গে ইঁটের টুকরো বেঁধে ২ কিঃ মিঃ প্রকাশ্য রাস্তায় হাঁটতে বাধ্য করা হয়। এ ঘটনা সাংবাদিকদের জানানোর অভিযোগে বাবুর আত্মীয় বিমল রায় ও সুকুমার রায়কেও বেদম প্রহার করেছে দুর্বৃত্তরা।

● ১০ জুলাই ২০১১, রাজশাহী জেলার গোদাগারী উপজেলার সিমলা দিঘীপাড়া গ্রামের আদিবাসী খ্রীস্টধর্মাবলম্বী ও শিক্ষিকা মরিয়ম সূর্যকে (৫৫) নির্মমভাবে হত্যা করেছে কতিপর মুসলিম দুর্বৃত্ত। তার সঞ্চিত অর্থ ও স্বর্ণলংকার লুট করা হয়েছে। পুলিশের ধারণা উক্ত মহিলার সম্ভ্রম লুটের পর শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে। হত্যার পর বিবস্ত্র অবস্থায় লাশ একটি গাছে ঝুলিয়ে দেয়। এই বিভৎস হত্যাকাণ্ডে এলাকায় আদিবাসীদের মধ্যে আতংক দেখা দিয়েছে।

● ১১আগস্ট ২০১১, মৌলভীবাজার জেলার কুলাউরা উপজেলার টুলিপাড়া এলাকায় একটি সেতুর নিচ থেকে নীলিমা দেব (৮০) নামে এক হিন্দু মহিলার লাশ পুলিশ উদ্ধার করেছে। ওই মহিলা চুনঘর গ্রামে একটি মন্দিরের সেবাইত ছিলেন। ধারণা করা হচ্ছে উক্ত মহিলাকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে। মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পর মুসলিম দুর্বৃত্তরা লাশ উক্ত স্থানে ফেলে দিয়ে চলে গেছে।

● ১৭ই আগস্ট ২০১১, লক্ষীপুর জেলার রায়পুর পৌর শহর এলাকায় মুড়িহাটায় অবস্থিত হিন্দু সম্প্রদায়ের ‘জগন্নাথ দেব’ মন্দিরে মুসলিম দুর্বৃত্তদের একটি দল হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীদের ছোড়া ইট পাটকেলের আঘাতে দুটি প্রতিমা চুর্ণ বিচুর্ণ হয়েছে। এ ঘটনায় মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক আদালতে একটি মামলা দায়ের করেছেন।

● ২১ জুলাই ২০১১, চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই উপজেলার অষ্টম শ্রেণীতে পাঠরত হিন্দু ছাত্র তন্ময় পালকে মুসলিম দুর্বৃত্তরা অপহরণ করে নিয়ে গেছে। স্কুল থেকে ফেরার পথে তাকে অপহরণ করা হয়। ২২ জুলাই স্থানীয় থানায় অভিযোগ জানানো হলেও পুলিশ অদ্যবধি তাকে উদ্ধার করতে পারেন নাই।

● ৪ আগস্ট ২০১১ গভীর রাতে, ঢাকা জেলার আশুলিয়া থানার ইয়ারপুর এলাকায় এক হিন্দু বাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্র ধারী মুসলিম দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা ৫০০ গ্রাম স্বর্ণালংকার ও নগদ ৫ লাখ টাকা লুট করে নিয়ে গেছে। হামলা কারীদের বেদম প্রহারে গৃহকর্ত্তা ব্যবসায়ী আশু দাস, তুষ্ট দাস, বাসুদেব দাস ও বীথিকা দাস নামে এক মহিলা গুরুতর আহত হয়েছে। স্থানীয় থানায় এ ঘটনায় অভিযোগ জানাতে গেলে ও সি ১৫০ গ্রাম স্বর্ণালংকার লিপিবদ্ধ অভিযোগ করতে বাধ্য করেছে বলে অভিযোগ।

●২ আগস্ট ২০১১, গোপালগঞ্জ জেলা শহরে বসবাসকারী খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী বাবলু বিশ্বাসের বাড়ি-ঘর বল পূর্বক দখল করে নিয়েছিল গোপালগঞ্জ শহর আওয়ামী লিগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুসলিম দুর্বৃত্ত মাহবুবুর রহমান ডিগল মিয়া। এর প্রতিবাদ জানাতে গেলে স্থানীয় থানার ভিতর পুলিশের সামনে প্রহৃত হন এক খ্রীস্ট ধর্মজাক। এর পর প্রতিমন্ত্রী প্রমোদ মানকিনের হস্তক্ষেপে দখলীয় বাড়ি ছেড়ে চলে যায় আওয়ামী নেতা।

● ৮ আগস্ট ২০১১, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের ৩৭ তম ব্যাচের হিন্দু ছাত্র পিনাকপাণি ভট্টাচার্য বেদম প্রহৃত হলেন ছাত্রলীগ নেতা মুসলিম দুর্বৃত্ত আজগর আলীর হাতে। বেলা ১২টার সময় প্রকাশ্য স্থানে শত শত লোকের সামনে মোটা বাঁশের লাঠি দিয়ে নির্মমভাবে প্রহারে গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

● ৮ আগস্ট ২০১১ রাতে, নরসিংদী জেলা শহরে হিন্দু ব্যবসায়ী মিণ্টু সাহা আগ্নেয়াস্ত্রধারী মুসলিম দুর্বৃত্তদের গুলিতে গুরুতর আহত হয়েছে। এলাকার দুর্বৃত্ত মোঃ টুটুল মিয়া ও বাদশা মিয়া এক লাখ টাকা জিজিকর হিসাবে মিণ্টুর নিকট দাবি করে। এই টাকা দিতে অক্ষমতা

এরপর দুয়ের পাতায়

সংখ্যালঘু উৎপীড়ন

(একের পাতার পর)

প্রকাশ করলে মিণ্টুর পেটে এবং কোমরে গুলি চালিয়ে দেয় দুই দুর্বৃত্ত।

● ৩০ জুলাই ২০১১ রাতে, বান্দরবাণ জেলার লামা উপজেলার সিলেরতুয়া নাইক্ষ্যংঝিড়ি এলাকায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী আদিবাসী বাসিন্দা, হ্লামেচিং (৩৬), অংসাউ মারমা (৭০) ও পাঁচ বছর বয়সী শিশু মুংনুচিং মারমাকে ধারালো দাঁ দিয়ে কুপিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। হত্যাকারী মুসলিম দুর্বৃত্ত আবু মুসা ওই বাড়ির এক কিশোরীকে ধর্ষণ ও অপহরনের চেষ্টা করলে পরিবারের লোকজন বাধা দেয়। এ সময় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে ওই তিন জনকে হত্যা করে। পালিয়ে যাবার সময় স্থানীয় আদিবাসীরা দুর্বৃত্তকে ধরে পুলিশের নিকট সোপর্দ করেছে। হত্যাকারী পুলিশের নিকট বর্ণনায় বলেছে, একটি গাছ কাটার দা পাথরে ধার দিয়ে ৭০ বছর বয়সী অংসাউ মারমার গলায় কোপ দেয়। এতে তার মাথা থেকে শরীর আলাদা হয়ে যায়। এর পর ৩৬ বছর বয়সী হ্লামেচিং মারমার গলায় কোপ দেয় এতে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে। গলাকাটা মায়ের পাশে ঘুমন্ত শিশু জেগে উঠলে তার পিঠে তিনবার দা দিয়ে কোপ দেয় শিশুটি লুটিয়ে পরে মারা যায়। পুলিশ হত্যার ঘটনা অন্য পথে চাপা দেবার জন্য সক্রিয় রয়েছে বলে বিভিন্ন মহলের অভিযোগ শোনা যাচ্ছে।

● ১৯ আগষ্ট ২০১১ খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি উপজেলার ওয়াকছরি গ্রামের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী আদিবাসী প্রু মারমাকে (৪২) জবাই (গলা কেটে) নির্মমভাবে হত্যা করেছে মুসলিম দুর্বৃত্তরা। স্থানীয় থানায় এঘটনায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

● ১৯ আগষ্ট ২০১১ রাতে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার কাইমপুর গ্রামে দুটি হিন্দু বাড়িতে মুসলিম দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়ে ৯০ হাজার টাকার সম্পদ লুট করে নিয়েছে বলে জানা গেছে। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের এক গৃহবধু বেলারানী লিখিতভাবে স্থানীয় থানায় অভিযোগ জানিয়েছে।

গত আগস্ট সংখ্যায় "চার নেতার বাংলাদেশ সফর ও হাসিনার ভারত প্রীতি" ইন্দ্রজিত (বাংলাদেশ) লিখিত সমালোচনা মূলক লেখাটি লেখকের ব্যক্তিগত মতামত। এজন্য সম্পাদক দায়ী নহে।

তবু কেন রাষ্ট্রধর্ম

(একের পাতার পর)

সংশোধন করে রাষ্ট্রপরিচালনার বর্জন করেছিলেন, ধর্মাশ্রিত রাজনীতি করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন এবং সংবিধানের সূচনায় বিসমিল্লাহ যোগ করেছিলেন।

বাংলাদেশের আরেক সামরিক অভ্যুত্থানের নায়কের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সারা দেশে যখন তুমুল আন্দোলন চলছিল, তখন নিজের ক্ষমতা নিরাপদ করার আশায় তিনি ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার বিধান সংবলিত এক সাংবিধানিক সংশোধনী জাতীয় সংসদকে দিয়ে পাস করিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর ও বি এন পি সহ অনেক রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজ প্রতিবাদ জানিয়েছিল এবং এককভাবে ও সমষ্টিগতভাবে অন্তত তিনটি মামলা হাইকোর্টে রুজু হয়েছিল।

দেশের মানুষ কেউ কখনো সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার উচ্ছেদ চায়নি, রাষ্ট্রধর্মের প্রবর্তনও চায়নি; ক্ষমতাসীন ব্যক্তি ও গোষ্ঠী নিজের স্বার্থে এসব উদ্যোগ নিয়েছিল এবং, বলা যায়, দেশের অধিকাংশ মানুষ তা মেনে নিয়েছিল। তবে সচেতন জনগোষ্ঠী বরাবরই এসব ব্যবস্থাকে বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর বিরোধী এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থী বলে গণ্য করে এসেছে। তারা বারবার করে ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে ফিরে যাওয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে দাবি জানিয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধানের রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতিগুলো গৃহীত হয়েছিল পাকিস্তান আমলে পূর্ব বাংলার মানুষের দীর্ঘকালের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। এই প্রক্রিয়াই ১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ গঠিত হয় সে সময়ের একমাত্র অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানরূপে; ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অব্যবহিত পরে অসাম্প্রদায়িক ছাত্র-সংগঠনরূপে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ও অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলরূপে গণতন্ত্রী দলের প্রতিষ্ঠা ঘটে। এই পক্রিয়ায়ই পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের নাম থেকে এবং তারপরে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নাম থেকে মুসলিম শব্দ বর্জিত হয়। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রণ্টের একুশ দফার শীর্ষদেশে নীতি হিসেবে যদিও অঙ্গীকার করা হয় যে, 'কোরান ও সুন্নার মৌলিক নীতির খেলাফ কোন আইন প্রণয়ন করা হইবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা হইবে', তবু এ নীতি কোনো দফা হিসেবে ঘোষিত হয়নি এবং এতে রাষ্ট্রের ইসলামিকরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র (তখন তাই বলা হতো) প্রণয়নের সময়ে গণপরিষদের আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রের ইসলামি প্রজাতন্ত্র নামকরণের বিরোধিতা করে। একই সময়ে পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থাপক পরিষদে যুক্ত নির্বাচনপ্রথার পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করে পাকিস্তানের দ্বিজাতিতত্ত্বের মূলে কুঠারাঘাত করা হয় এবং পূর্বাঞ্চলে এই ব্যবস্থা পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের বিধানরূপে গৃহীত হয়। ন্যাশানাল আওয়ামী পার্টি এবং দলটি বিভক্ত হলে এর উভয় অংশ, বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন এবং অধিকাংশ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ক্রমশ ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাবের প্রসার ঘটাতে সাহায্য করে। অপরপক্ষও নিষ্ক্রিয় ছিল না। তারই পরিপ্রেক্ষিতে, ১৯৬৯ সালে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। ১৯৭০ সালে জেনারেল ইয়াহিয়া খান যে-আইনগত কাঠামো অদেশ জারি করেন, তার ২০ ধারায় বলা হয়েছিল যে, পাকিস্তান পরিচিত হবে ইসলামি প্রজাতন্ত্র বলে, যে-ইসলামি ভাবাদর্শ পাকিস্তানের ভিত্তি তা রক্ষা করা হবে এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান হবেন একজন মুসলমান। ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বরে আরো দুটি ধারার সঙ্গে ছাত্রলীগ এই ধারা সম্পর্কে আপত্তি জানায় এবং আদেশটি বাতিলের দাবি করে। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ছাত্র ইউনিয়ন প্রস্তাব করে যে, 'রাষ্ট্র হইবে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র'।

বাংলাদেশ যে একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র।'

বাংলাদেশ যে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হবে মুক্তিযুদ্ধের কালে আমাদের নেতারা সেকথা অনেকবার বলেছিলেন। শুধু প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ নন, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ এম কামরুজ্জামান, এমনকি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশারফ অহমদ ত্ত একাধিক বক্তৃতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় তিন নীতির—গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার—ঘোষণা দিয়েছিলেন। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিরূপে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে রেসকোর্সের জনসভায় বঙ্গবন্ধু সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন যে, বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র "বাংলাদেশ" রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।' পরে তিনি এর সঙ্গে আরো একটি নীতি যোগ করেন—জাতীয়তাবাদ। ১৯৭২ সালে এই চার নীতিই বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র-পরিচালনার মূলনীতিরূপে গৃহীত হয়।

সুতরাং এ-কথা জোর দিয়ে বলা চলে যে, রাষ্ট্র পরিচালনার এইসব মূলনীতি হঠাৎ করে কারো ইচ্ছায় প্রণীত হয়নি, কারো স্বার্থ রক্ষার জন্যেও নির্ণীত হয়নি। এ হলো জনগণের দীর্ঘকালের সংগ্রামের ফল, নেতাদের সুচিন্তিত পথনির্দেশনার পরিণাম। অন্য কোনো রাষ্ট্রের প্রভাবে বা অনুকরণে নয়, অন্য কোনো রাষ্ট্রের প্রভাবে বা অনুকরণে নয়, অন্য কোনো রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধতা বা কৃতজ্ঞতাস্বরূপও নয়, এ ছিল একান্তই আমাদেরই চয়িত আদর্শ। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৪৯ সালে যখন ভারতের সংবিধান প্রণীত হয় তখন রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশক নীতিগুলোর মধ্যে সমাজতন্ত্র বা ধর্মনিরপেক্ষতার স্থান ছিল না। সংবিধানের প্রস্তাবনায় সে-দেশের রূপ নির্ণীত হয়েছিল সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র (Sovereign democratic republic) বলে। পরে ১৯৭৭ সালে গৃহীত দ্বিচত্বারিংশ সংশোধনীর দ্বারা তা সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র (Soverign Sociallist secular democratic republic) করা হয়। ততদিনে রাষ্ট্রধর্মের প্রবর্তন বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক কাঠামোকে আঘাত করেছে। রাষ্ট্রধর্মের প্রবর্তন বাংলাদেশের মানুষকে মুসলমান (রাষ্ট্রধর্মের অনুসারী) এবং অমুসলমান (শান্তিতে পালনযোগ্য অন্যান্য ধর্মের অনুসারী) বিরক্ত করেছে। রাষ্ট্রধর্মের প্রবর্তন বাংলাদেশের অমুসলমান নাগরিকদের মধ্যেও এক ধরনের স্বাতন্ত্রবাদের সূচনা করেছে। রাষ্ট্রধর্ম প্রবর্তনের পরে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্যপরিষদের প্রতিষ্ঠা তারই দৃষ্টান্ত। ১৯৯০, ১৯৯২ ও ২০০১ সালের সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ঘটনা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মনে অনাস্থার সৃষ্টি করেছে। তার ফলে একদিকে ঘটেছে নীরব দেশত্যাগ, অন্যদিকে দেখা দিয়েছে তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রধার পুনঃপ্রবর্তন কিংবা সংরক্ষিত সংসদীয় আসনের চিন্তা।

বিশেষ ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রের পক্ষপাতের ফলে যে নাগরিকদের মধ্যে বিভেদ ও বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়, একথা অনেকে মানতে চান না। তাঁরা যুক্তরাজ্যের দৃষ্টান্ত দেন। স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্রের উত্তরের পরে ইউরোপে ক্রমে ধর্ম ও রাষ্ট্রের—ষ্টেট ও চার্চের—পৃথকীকরণ ঘটে এবং সকল নাগরিকের ইহলৌকিক কল্যাণসাধন রাষ্ট্রের দায়িত্ব বলে স্বীকৃত হয়। তা সত্ত্বেও ইউরোপের সব দেশে রাষ্ট্র ও ধর্ম পৃথক হয়নি। যুক্তরাজ্যের রাজা ও রানী চার্চ অফ ইংল্যাণ্ডের রক্ষাকর্তা—এই অর্থে অ্যাংলিকান চার্চের ধর্মই যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রীয় ধর্ম। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার একাধিক দেশ, আয়ারল্যাণ্ড, ইতালি ও স্পেনেও রাষ্ট্র বিশেষ বিশেষ ধর্মের আনুকূল্য করে থাকে—তবে পৃষ্ঠপোষকতা বলতে আমরা যেমন বুঝি, তেমন নয়। সেসব দেশে আমাদের ক্যাথলিক ধর্মের অসাধারণ প্রাধান্য সত্ত্বেও ফ্রান্স ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, প্রোটেষ্টাণ্টদের গরিষ্ঠতা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। ইসলামি রাষ্ট্রসংস্থার (ওআইসি) অর্ধেক সদস্য-রাষ্ট্রেরই রাষ্ট্রধর্ম বলে কিছু নেই। ইন্দোনেশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত কিংবা সিরিয়ার মতো দেশ রাষ্ট্রধর্ম স্বীকার করে না। তুরস্ক কেবল ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র নয়, তার সংবিধানের যে তিনটি বিধান কোনোমতে সংশোধনযোগ্য নয়, ধর্মনিরপেক্ষতা তার একটি সেদেশে সম্পত্তির উত্তরাধিকার এবং নারীর স্বাধীনতা বিষয়ে ধর্মনিরপেক্ষ আইন প্রচলিত। সুতরাং কেবল উদাহরণ দিয়ে লাভ নেই, স্বদেশের অভিজ্ঞতা ও পরিস্থিতির বিবেচনায় এ-বিষয়ে করণীয় নির্ণয় করা আবশ্যক। ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ ফ্রান্সকে ধর্মনিরপেক্ষ থাকার প্রেরণা দিয়েছে; আদি বসতি স্থাপনকারীদের ধর্মীয় নিপীড়ন ভোগের অভিজ্ঞতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিশেষ কোনো ধর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকতে দেয়নি। পাকিস্তান আমলে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির যে কুফল আমরা দেখেছি, মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ধর্মের নামে যে নিপীড়ন এখানে চলেছে এবং বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠায় সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মিলিত সংগ্রামের যে ইতিহাস আমরা রচনা করেছি, তার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ গ্রহণই আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক ও সংগত ছিল। আমরা ঠিক তাই করেছিলাম।

পঞ্চদশ সংশোধনীর বলে সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার মূলনীতি ফিরে আসছে। ১৯৭২ সালের সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদ স্পষ্টই বলা হয়েছিল যে, 'ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য (ক) সব প্রকার সাম্প্রদায়িকতা, (খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদাদান, (গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার (ঘ) কোন বিশেষ ধর্মপালনকারীর প্রতি বৈষম্য বা তাঁহার উপর নিপীড়ন বিলোপ করা হইবে। একইসঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ এবং রাষ্ট্রধর্মের বিধান—অর্থাৎ রাষ্ট্র কর্তৃক ইসলামকে রাজনৈতিক মর্যাদাদান—কীভাবে পাশাপাশি

এরপর তিনের পাতায়

সঠিক জিনিস ছেড়ে দিয়ে নকলের দিকে ধায়। / তারা আসল নকল উভয়ই হারায়।। — চাণক্য

তবু কেন রাষ্ট্রধর্ম

(দুয়ের পাতার পর)

থাকতে পারে, তা আমাদের স্বল্পবুদ্ধিতে বোধগম্য নয়।

বাংলাদেশের জন্যে রাষ্ট্রধর্ম যে আবশ্যক, তা কীভাবে নির্ণীত হয়েছে? একথা কি আমরা ভুলে গেছি যে, বাংলাদেশের যে একমাত্র শাসক দেশবাসীকে রাষ্ট্রধর্ম উপহার দিয়েছিলেন, জনসাধারণ আন্দোলন করে তাঁকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে? আওয়ামী লীগকে ধর্মনিরপেক্ষতার সমর্থক জেনেও কি দেশের মানুষ একাধিকবার তাকে ক্ষমতায় আনেনি? তাহলে কাদের মুখ চেয়ে আমরা রাষ্ট্রধর্ম রাখতে চাইছি এবং ধর্মনির্বিশেষে সকল নাগরিককে দিয়ে বিসমিল্লাহ বলতে চাইছি?

রাষ্ট্রধর্মের বিধান বাংলাদেশে ধর্ম ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করেছে। তাঁরা মুসলমান-অমুসলমানে পার্থক্য করেছেন, শিয়া ও আহমদিয়াদের অমুসলমান বলে ঘোষণা করেছেন এবং রাষ্ট্রের কাছে অনুরূপ ঘোষণা দাবি করেছেন। তাঁরা নারীপুরুষে বৈষম্যসৃষ্টির অভিপ্রায় প্রকাশ্যে জ্ঞাপন করেছেন। তাঁরা নারীপুরুষ নির্বিশেষে মুরতাদ ঘোষণা করে মানুষকে পীড়ন করেছেন। তাঁরা নির্বিবাদে ফতোয়া দিয়ে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছেন। এ থেকেও আমাদের শিক্ষা নেওয়ার রয়েছে।

বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্রে সকল নাগরিকের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার পরে রাজনৈতিক নেতারা আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে সৃষ্ট বাংলাদেশে আমাদের নেতারা কি সকল নাগরিককে সেই আদর্শ বজায় রাখার প্রেরণা দেবেন না।

সৌজন্য ঃ প্রথম আলো ১৫ জুলাই ২০১১।

বীর যোদ্ধা

শৈলেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

ইতিহাস জাতির জীবনে এক মূল্যবান সম্পদ। প্রকৃত ইতিহাস বিকৃত হলে জাতির মেরুদণ্ড ঘুণে ধরে যায়। জাতি হয়ে পরে নিস্তেজ, হারিয়ে যায় স্বকীয়তা, নিজ দৃষ্টির আড়ালে ধ্বংস মুখে পতিত হয়। অপরের মুখে বুলি আওড়াতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। আজকাল বিভিন্ন লোকের মুখে শোনা যায় "বাঙালি হিন্দু মার খায়—কাঁদে—পালায়।" ইতিহাস না জানার কারণে এই সব অবান্তর উক্তি আমরা শুনতে পাই। কিন্তু বিপরীত ইতিহাস জানার বা সংগ্রহের প্রচেষ্টা আমাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। ব্যতিক্রম ধর্মী শৈলেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয় "বাংলার লাঞ্ছিত মণীষী" নামক ইতিহাস ভিত্তিক পুস্তক রচনা করে আমাদের পিপাসা সামান্য মিটিয়েছেন। উক্ত পুস্তকে "বীর যোদ্ধা" অংশ থেকে এই পত্রিকায় নিয়মিত ধারাবাহিক প্রকাশিত হবে। আশাকরি লেখকের তথ্য সমৃদ্ধ রচনা পাঠ করে মতামত জানাবেন।

গিরিবাগজা

বাংলা ১২০০ সালের প্রথম দিকে খুলনা, যশোহর এবং ফরিদপুর সংলগ্ন প্রধান এলাকায় অনেক লাঠিয়াল সর্দার এবং বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এদের মধ্যে বড়নাল এবং ভবানীপুর গ্রাম দুটিকে কেন্দ্র করেই বেশ কয়েকজন বিখ্যাত মানুষ জন্ম গ্রহণ করেন যেমন গিরিবাগজা, নীরোদ সর্দার প্রভৃতি। গিরিবাগজা হরিণের গতিতে দৌড়তে পারতেন। অন্যদের মধ্যে কালি টিকাদার, চণ্ডী, ভাগ্যধর, বাটাই নগেন, যোগেন মহরা প্রমুখ বিখ্যাত। এদের মধ্যে চণ্ডী খুব সাহসী এবং জেদী সর্দার ছিলেন।

মথুর শিরালী

যশোহরের ঝামাঘোপ চকের উপরে ঢালী এবং শিরালী বংশ ছিল নামকরা সর্দার বংশ। এদের নাম শুনলে মুসলমানদের হৃৎকম্প শুরু হোত। বঙ্গবরেণ্য রতিকান্ত শিরালী এই বংশের মানুষ ছিলেন। মথুর শিরালী নলদী পরগনার একজন সমাজপতি ছিলেন। মথুরাবাবু এক দিকে নমঃ সমাজের সামাজিক নিয়মকানুন, আচার বিচার নীতি-নির্ধারন করতেন অন্য দিকে অত্যাচারী মুসলমানদের এবং ইংরেজদের প্রতিনিধি জমিদারদের অত্যাচারের মোকাবিলা করতেন। এখনো লোক মুখে প্রচলিত হয়ে আসছে যে 'যদি কোন মুসলমান, জোর করে কোন হিন্দুর ফসল বা কোন জিনিষ নিয়ে যেত, এবং সে খবর মথুরবাবুর কানে পৌঁছত তবে যে ব্যক্তি করেছিলেন তাকে দিয়েই জন সমক্ষে ঐ জিনিষ ফেরৎ দিতে বাধ্য করতেন। তার ঐরূপ দৃঢ়তার জন্য তার জীবিতকালে যশোহর জেলার হিন্দুগণ দারুণ স্বস্তিতে বসবাস করতেন। মথুর শিরালীর এই সব দুঃসাহসিক কাজে সেনাপতি ছিলেন তারই জেঠতুত দাদা সর্দার নেপাল শিরালী। পরবর্তীকালের স্বনামধন্য রতিকান্ত সিরালী ছিলেন নেপাল শিরালীর পুত্র।

ভবিতব্যহীন

শরৎকমল সরকার

অপরার্থিতা, বিমূঢ়তা মানুষকে শুধু সংকীর্ণ গণ্ডিবদ্ধ করে তোলে না,—তার জীবনকে করে তোলে যন্ত্রনাময় দুর্বিষহ। এই প্রবণতা যখন কোন জাতীয় জীবনে প্রবেশ করে তখন সে জাতি শুকিয়ে আসা, চরাপড়া, নাব্যতাহীন নদীর মতো প্রাণহীন হয়ে পড়ে। তার চলায় গতি যায় থেমে। বাংলাদেশী উদ্বাস্তুদের অনেকটা সেই অবস্থা। কিন্তু মানুষ যেহেতু রক্তমাংসের জীবন্ত প্রতীক, সেহেতু তার থেমে যাওয়া জীবন পুনরায় গতিসঞ্চার হতে পারে। তবে সে যদি পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখেও না দেখার ভান করে, নির্বুদ্ধিতার শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে আসার চেষ্টা না করে তাহলে তার জীবনে আর গতি সঞ্চার হবে না। জগদ্দল পাষাণের মতো সে জীবন কেবলই অভিশাপের বোঝা নিয়ে থমকে থাকবে—কোনদিন তার ব্যত্যয় ঘটবে না।

দেশভাগের বলি বাংলাদেশী উদ্বাস্তুদের জীবন যে আজ হিমালয় সম জগদ্দল পাষাণের মতো নিশ্চল, তা বলাই বাহুল্য। সেই নিশ্চলতা কাটিয়ে তারা যে সচল হয়ে উঠবে, এমন লক্ষণ তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। তারা যে মূঢ়, নির্বোধ সেটাই তারা বোঝে না, আর এজন্য তারা নিজেদের অত্যন্ত চালাক ভাবে। আর এজন্যই বড় বিপদ অক্টোপাশের মতো চারদিক থেকে তাদের ঘিরে ধরছে।

আমি একদা এক আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে আমার এমন এক অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা এই নিবন্ধে উল্লেখ না করে পারছি না। যদিও তেমন ঘটনা বর্তমান আকছার ঘটছে, তবুও বলি,—সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমার সেই আত্মীয়ের সঙ্গে তার এক পলিতকেশ প্রতিবেশি গল্প করছিলেন। তাঁর মুখে বঙ্গালি উপভাষার বহর দেখে তাঁর আদি নিবাস সম্পর্কে আমার কোন সংশয় রইল না। আমি অদূরে বসে তাঁদের কথাবার্তা শুনছিলাম। তাঁদের গল্পের মর্মার্থ এই,—লোকটীর মেজো নাতির বিয়ে ঠিক হয়েছিল বারাসতের দিকে। পাত্রী সুশিক্ষিত, সুশ্রী; দেনা পাওনাতে পাত্রীপক্ষ পিছ-পা নন, কিন্তু তবুও বিয়ে হলো না। আমি কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেন, বিয়েটা হলো না কেন?

পলিতকেশী বললেন, মাইয়ার বাপ-মাগো কেউর র‍্যাশন কাড, ভুটের কাড নাই।

জবাব শুনে আমি বিস্মিত হলাম। এতটুকু বয়স থেকে অনেক বিয়ে দেখেছি, ঢের দেখেছি বিয়ে ভেঙে যেতে। অধিকাংশ পণকেন্দ্রিক হলেও বিচিত্র কারণও লক্ষ্য করেছি। কিন্তু এমন অভিনব কাণ্ড আমার চোখে সেই ছিল প্রথম। আমি বললাম, রেশন কার্ড বা ভোটার কার্ড নেই তাতে কি হয়েছে? একটা বিয়ের ক্ষেত্রে ওসবের প্রয়োজন কি?

তিনি দুই চোখ অতিশয় বিস্ফোরিত করে বললেন, কন্ কী মশাই, উই সবের প্রোইজোন নাই? জববর আছে। উই হগল না থাকা যে যোমের দক্ষিণ দুয়োরে যাওনের সুমান। আর থাকলে?

তাইলে তো কুনো ভাবনা নাই।

আপনাদের নিশ্চয়ই সবকিছু আছে?

হ।

কতদিন হলো ওদেশ থেকে এসেছেন?

পাঁচ-ছয় সন হইব।

আমি আর কোন প্রশ্ন করলাম না। লোকটার বয়সকে শ্রদ্ধা করতে হয়, কিন্তু তাঁর অজ্ঞতাকে শ্রদ্ধা করা যায় না। কেন না, তাঁদের মতো শ্রদ্ধেয় মানুষদের অজ্ঞতা আর নির্বুদ্ধিতার জন্য লক্ষ লক্ষ বাংলা দেশী বাঙালি হিন্দুদের সমূহ সর্বনাশ হয়েছে। ভিটেমাটি হারাতে হয়েছে, হারাতে হয়েছে আপনজনদের, মান-সম্মান, ইজ্জত। ওপার বাংলায় আজও যারা বসবাস করছে, তাদের অবস্থার কথা কহতব্য নয়। তাদের ধর্মীয় মতাদর্শ ইসলাম ধর্মের আদর্শে সম্পৃক্ত নয়, এই অপরাধে প্রতিনিয়ত আক্রান্ত হচ্ছে তারা,—তাদের অর্থসম্পদ নষ্ট হচ্ছে, বাস্তু-ভদ্রাসন বেদখল হচ্ছে, প্রাণ যাচ্ছে, লুণ্ঠিত হচ্ছে মেয়েদের সম্ভ্রম। এই সমস্ত মর্মান্তিক দুর্দশার শিকার হয়ে প্রাণ বাঁচাতে যারা পূর্বপুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে তারা ভারতের মাটিতে কিছুকাল বসবাস করার পর পূর্বের সমস্ত কথা বেমালুম ভুলে যাচ্ছে। এদেশের দুর্নীতি পরায়ণ রাজনৈতিক নেতাদের পায়ে তৈল মর্দন করে, অর্থ গলাধঃকরণ করিয়ে একটা ভোটার কার্ড, একটা রেশন কার্ড বানিয়ে নিয়ে তারা নিশ্চিন্ত হচ্ছে; যেন তাদের আর কোন ভাবনা নেই, তারা এখন পাকাপোক্ত ভারতীয় নাগরিক। সুতরাং নাগরিক রূপ ভোজ্য বিষয়ে আর বদ হজমের কোন সম্ভাবনা নেই। অতএব শান্ত নিরীহ গরুর মতো নিশ্চিন্ত মনে জাবর কাটে।

কিন্তু তাদের এই ভাবনা কি বাস্তবিক সঠিক? তারা কি একটিবার ভেবে দেখেছে দিল্লীর সংসদে পাশ হওয়া নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল—২০০৩ তাদের পক্ষে কতখানি বিপজ্জনক? কতখানি মারণাস্ত্র। ১৯৪৫ সালের দুটি পারমাণবিক বোমা হিরোসীমা ও নাগাসাকিকে ধবংস করেছে, বহু মানুষের মৃত্যু ঘটিয়েছে, পঙ্গু করেছে। তেমনি ১৯৪৭ সালের ভারত ভাগ বাঙালি হিন্দু জাতিকে এক পঙ্গু জাতিতে পরিণত করেছে; আর ২০০৩ সালের নাগরিকত্ব আইন সেই জাতির গলায় ফাঁসির রসি পরিয়ে দিয়েছে। তবুও এ জাতি নিশ্চুপ, নিঃশঙ্ক, নির্ভীক। ভাবছে ভয় নেই। কিছু হবে না। আর যদি কিছু হয়ও তাতে ভয় পাওয়ার কি আছে? স্বয়ং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর (রাজনৈতিক দাদারা) সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। এই আহাম্মকী ভাবনা কি পৃথিবীতে দ্বিতীয় আছে? তবুও তারা ভাবে, সেই দেবতারা যদি তাদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হন, তাহলে ভাগ্যে যা আছে তাই ঘটবে। তবে আমার ব্যক্তিগত অভিমত, তাদের ভাগ্যের দোষারোপ না করে তাদের আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ শেষ উপায় হলো পিষ্ঠ দান। যা হয় পিঠের ওপর দিয়েই হোক। পিঠে যদি বড্ড বেশি লাগে, সেই যন্ত্রণা কয়েক মুহূর্তে উপশমের জন্য বিড়ালের মতো চর্মসঞ্চালন করতে হবে। এই উপায়ে মার্জারকুল প্রচুর মার হজম করতে পারে,—ভুলতে পারে যন্ত্রণার কথা, মারের কথা। সুতরাং শান্ত নিরীহ এই জাতির জন্য এটাই একমাত্র অব্যর্থ মহৌষধ।

এই প্রবন্ধ পড়তে পড়তে তোমাদের যে মস্তিস্ক পীড়া শুরু হবে তাতে লেশমাত্র সংশয় নেই। এবং তোমরা যে প্রাবন্ধিকের ওপর মারমুখী হবে তাও সন্ধিগ্ধহীন। কিন্তু তোমরা বড় জোর গালিগালাজ করতে পার। অবশ্য তাতে লেখকের কিছু যায় আসে না। তোমাদের অবগতির জন্যই বলছি, এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য একবিন্দু মিথ্যে কথা প্রচার নয়; কোনরূপ উস্কানি দেবার দুরভিসন্ধিও নেই। তোমরা যদি স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য কর, তাহলে নিশ্চয়ই দেখতে পাবে, বাংলাদেশী বাঙালি হিন্দুদের দুর্ভাগ্যের জন্য তারা নিজেরাই অনেকাংশে দায়ী। তাদের সব চেয়ে বড় ত্রুটী তারা নিজেদের বিচারবুদ্ধির কোন তোয়াক্কা না করে অপর দ্বারা চালিত হয়। এবং তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষার জন্য ব্যস্ত, তাছাড়া তথাকথিত হাঙ্গামা এড়ানোর জন্য আন্দোলনমুখী হতে চায় না। কিন্তু মুক্তির শেষ উপায় যে গণ-আন্দোলন, সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা তার নিদর্শন কি ইতিহাসে নেই? আর হাঙ্গামা, সে যদি ঘাড়ের ওপর চেপে বসে তখন শান্ত নিরীহ হয়ে বসে থাকলেই কি সে কাঁধ থেকে নেমে যাবে? মুক্তি দেবে? গত বিধানসভা নির্বাচনের (২০০৬ সালের) সময় যে প্রশাসনিক হাঙ্গামা হয়েছিল তা কি বাংলাদেশী উদ্বাস্তুদের মুক্তি দিয়েছিল? আজও বহু উদ্বাস্তু জেল খাটছে। সেদিনের পুলিশী অত্যাচার মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে হার মানায়। সেই পুলিশ কাদের ছিল? যাদের কথায় উদ্বাস্তুরা ওঠাবসা করে তাদেরই পুলিশ। তাহলে উপায় কি? এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। আমি বলব উপায় নিয়ে তোমরা ভাব; তোমরা যারা, ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড বানিয়ে নিতান্ত নিশ্চিন্ত মনে পরমানন্দে দিন কাটাচ্ছ তারা এটুকু জেনে রেখ, আগামী দিনে তোমাদের শুধু ওই সমস্ত নথীপত্র বাতিল হবে না, যে সমস্ত জমি জায়গা কিনে বাড়িঘর বানিয়েছ তাও বাজেয়াপ্ত হবে। অসংঘবদ্ধ, নিষ্ক্রিয়তার জন্য তোমরা অনেক আগেই দেশহীন, মেরুদণ্ডহীন এক অভিশপ্ত জাতিতে পরিণত হয়েছে। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা পথের সারমেয় সন্তান পর্যায়ভুক্ত হওয়া।

এখন এই অবস্থায় তোমরা কি করবে? চাষার বলদের মতো যষ্টাঘাত সহ্য করে স্বজাতির লাশ নিয়ে গাড়ি টানবে? না মত্ত হাতির মতো রুখে দাঁড়াবে? তোমরা তো জান, মত্ত হাতির কাছে বড় বড় মহীরুহ কিছুই নয়; বড় বড় প্রাচীরও সে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারে। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ২০০৩ তোমাদের বেঁচে থাকার সম্মুখে যে প্রাচীর খাড়া করেছে, তাকেও তোমরা গুঁড়িয়ে দিতে পার। কিন্তু কি উপায়ে? তোমরা হয়তো ভাববে, তোমরা মত্ত হাতি নও, নিরীহ বাংলাদেশী মানুষ; তাই তোমাদের পক্ষে কোন মহীরুহ বা প্রাচীর ভাঙা সম্ভব

এরপর চারের পাতায়

দুর্জনের মিষ্ট বাক্যে কভু না ভুলিও। / তাদের কথায় বিশ্বাস না করিও।

মিষ্ট কথায় তুষ্ট করে তারা কার্য উদ্ধার করে। / বিষের কলসীর মত ত্যাগ করে তারে।।—চাণক্য

ভবিতব্যহীন

নয়। কিন্তু একটা কথা জেনে রেখো, হস্তি শক্তি কেবল হাতির গায়েই থাকে না; সে শক্তির অধিকারী যুব সমাজ; তোমাদের মধ্যে কি সেই শক্তি নেই? আছে, নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সেশক্তি তোমরা নিজেদের বাঁচার জন্য প্রয়োগ কর না, প্রয়োগ কর নিজেদের ধ্বংসের জন্য। ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড না থাকার কারণে পলিতকেশ সেই বৃদ্ধ শুধু তার নাতির বিয়ে দেন নি তা নয়, এমন ঘটনা বহু ঘটছে। শুধু এই সমস্যায় বলি, মেয়েরা নয়—ছেলে মেয়ে উভয়ই। এমন একটি বিয়ের ঘটনা এই প্রাবন্ধিকের জানা আছে, যেটা ছিল প্রেমঘটিত। উভয়পক্ষের অভিভাবকরা বিয়েতে রাজি, কিন্তু বাধ সাধল সেই ভোটার কার্ড ও রেশন কার্ড। কনের পিতা বেঁকে বসলেন,—তিনি কিছুতেই অনাগরিক পাত্রের হাতে কন্যাসম্প্রদান করবেন না। শুনে বরের বন্ধু বান্ধব তো আগুন। তারা স্থির করল কনে যখন রাজি আছে, তখন জোর পূর্বক কনে তুলে নিয়ে গিয়ে চার হাত এক করে দেবে। একাজের ফল যা হবার তাই হলো,—মারপিট, থানা পুলিশ কোর্ট। বিচারে বাংলাদেশী হবার অপরাধে উভয় পক্ষের জেল। কন্যার পিতা ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড দেখিয়েও ভারতীয়ত্বের প্রমাণ দিতে পারলেন না।

ঘটনাটি অনেকটা দুই মরুযাত্রীর কলহের মতো। একদা তাঁরা এক মরুভূমি পাড়ি দিচ্ছিলেন। তাঁরা কেউ কাউকে চেনেন না—কিন্তু বুঝলেন তাঁরা একই পথের পথিক। হাঁটতে হাঁটতে তাঁদের একজন পিছিয়ে পড়লেন। মাথার ওপর সূর্য তখন আগুন ঢালছে; পায়ের নিচে মরুবালু অগ্নিবমন করছে, বায়ু ও বহ্নিময়। যাত্রীদ্বয়ের প্রাণ যায় যায় অবস্থা। যাত্রা দেখলেন এই অগ্নিভূমি পাড়ি দিতে না পারলে তাঁদের আসন্ন মৃত্যুকে তাঁরা এড়াতে পারবেন না। সুতরাং যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ তাঁরা প্রাণপণ হাঁটার সিদ্ধান্ত নিলেন।

যে যাত্রীটি পিছিয়ে পড়েছিলেন, তিনি অগ্রসর হতে হতে এক সময় দেখলেন, তাঁর আগের যাত্রীটি একটা দাঁড়িয়ে থাকা উটের পেটের নিচে ছায়ায় বসে বিশ্রাম করছেন। তিনি একটু প্রাণ ফিরে পেলেন; পিছিয়ে পড়ে অগ্নিময় নিঃসঙ্গ বালুভূমিতে নিশ্চিত মৃত্যুর হাতছানি দেখছিলেন। এখন সহযাত্রীর সঙ্গে ছায়ায় বসে একটু বিশ্রাম করবেন। কিন্তু তিনি তাঁর কাছ ঘেষতে পারলে না। উটের ছায়া দখলকারী যাত্রীটি তেড়ে উঠলেন। এর ফল যা হবার তাই হল—দুজনের মধ্যে বেধে গেল তর্ক, দ্বন্দ্ব। তাঁদের এই কলহ দেখে উটটি মুচকি হাসল, সে গেল চলে; নিজের ছায়া রেখে যাওয়া যায় না বলে সে ওই নির্বোধ মানুষ দুজনকে করুণা করতে পারল না। ঝগড়া করতে করতে উটের ছায়া দখলকারী যাত্রীটির যখন সংবিৎ ফিরল তখন তাঁর মাথায় হাত। কোথায় সে উট, কোথায় তাঁরা ছায়া! এখন তিনি দ্বন্দ্ব করবেন না, এই মরণভূমি থেকে মুক্তির উপায় দেখবেন?

বোধকরি গল্পটির উদ্দেশ্য পাঠকের বুঝতে পেরেছেন। যারা রেশন কার্ড ও ভোটার লিস্টে নাম তুলে একান্ত নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এবং ভাবছে তাদের এই পাকাপোক্ত নাগরিকত্ব থেকে কেউ বিচ্যুত করতে পারবে না তারা মুর্খের স্বর্গে বাস করছে। তাদের রেশন কার্ড বা নাগরিকত্ব যে মরুযাত্রীদের উটের ছায়ার মতো ক্ষণস্থায়ী তা বলাই বাহুল্য। তোমরা ভালো করে সজাগ দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে দেখ, ভারত সরকার নাগরিকত্ব বিষয়ে কোন পদক্ষেপে এগচ্ছে। শুধু তোমরা তোমাদের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরদের কথা শুনে নিশ্চিন্ত থেকো না, তাদের কথায় মেষগতি ধারণ করো না। আমরা একদা বামপন্থী দেবতাদের কথা শুনেছি, তাদের কথায় চলেছি,—তোমাদের এই আনুগত্যের উপহার স্বরূপ তারা আমাদের কি দিয়েছে? দিয়েছে ধাপ্পা আর মরিচঝাঁপির গণহত্যা। এর আগেই ভারত সরকার পুনর্বাসনের নামে আমাদের বুকে লাথি মেরে পাঠিয়েছে শ্বাপদ সংকুল জঙ্গলে, খাল-বিল-নদী হীন রুক্ষ উষরভূমি অঞ্চলে। এখন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটেছে বলে মনে মনে আমরা আহ্লাদিত হচ্ছি; হয়তো আমরা ভাবছি, এবার আমাদের সমস্ত সমস্যার একটা সুরাহা মিলবে; কেন না নতুন সরকারের প্রধান কাণ্ডারীরা আমাদের অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু পূর্বের কথা আমাদের ভুললে চলবে না। বামপন্থীরা ক্ষমতায় আসার পূর্বে উদ্বাস্তুদের অনেক প্রতিশ্রুতি, অনেক আশ্বাস দিয়েছিল, কিন্তু বাংলার মসনদে আসীন হয়ে তারা মরিচঝাঁপির বধ্যভূমি উপহার দিয়েছিল। তাছাড়া নাগরিকত্ব বা উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান করতে পারে একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্র এই বিষয়টি নিয়ে কি ভাবছে? কেন্দ্রেরই নির্দেশে রাজ্যে রাজ্যে বাংলাদেশী চিহ্নিতকরণের কাজ চলছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে ইতিপূর্বে এতবড় পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ঐ মন্ত্রক প্রতিটি রাজ্য সরকারকে জেলাস্তরে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স গঠন করে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের ধড়পাকড় করার নির্দেশ দিয়েছে। প্রয়োজনে এদের তাড়া করে ধরা হবে, এবং বর্ডার এলাকায় অস্থায়ী জেল তৈরি করে আটকে রেখে পুশব্যাক করা হবে।

ইতি মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, মহারাষ্ট্র দিল্লি প্রভৃতি রাজ্যে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিত করণের কাজ দ্রুত বেগে এগিয়ে চলেছে, উড়িষ্যা সরকার তো চার হাজার ৮৩ জনকে চিহ্নিত করে ৪৮ জনকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যে 'ইউনিক আইডেন্টি কার্ড' চালু করেছে। এই কার্ড পাওয়ার ক্ষেত্রে যে সমস্ত সরকারী তথ্য ও পেপারস্ প্রয়োজন তা দেখাতে না পারলে ভোটার আই কার্ডে নামের আগে 'ডি' লেখা হবে। 'ডি' মানে ডাউটফুল পার্সন। ইতিমধ্যে আসামে ১,৫২,২৫৫ জন নাগরিককে 'ডি' ভোটারের পর্যায় ভুক্ত করা হয়েছে। যারা কোন রকম সরকারী সুযোগ সুবিধা পাবে না। ফলে ওই সমস্ত উদ্বাস্তুরা ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে।

অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিত করণের কাজে পশ্চিমবঙ্গের অর্ধেকেরও বেশী মানুষ ভারতীয় নাগরিকত্ব থেকে বিচ্যুত হচ্ছে। রাজ্য সরকারের পাইলট প্রকল্পের সমীক্ষায় দেখা গেছে, মুর্শিদাবাদ জেলার মুর্শিদাবাদ ও জিয়াগঞ্জ ব্লকের ৬০ শতাংশের বেশি মানুষ ভারতীয় নাগরিক হিসাবে কোন প্রমাণ দেখাতে পারে নি। একমাত্র ভারতীয় তারাই যারা ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী পর্যন্ত ভারতের স্থায়ী বাসিন্দা। অবশিষ্ট মানুষেরা বিদেশী, অনুপ্রবেশকারী। কিন্তু বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী নিয়ে দিল্লি হাইকোর্টে রুজু হওয়া একটি জনস্বার্থ মামলায় দিল্লি সরকারের সরকারী আইনজীবী ভি. কে. শালি জানান, সরকারী বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের আগে যে সব বাংলাদেশী উদ্বাস্তু ভারতে এসেছেন, তাঁদের দেশে ফেরাতে পাঠানো হবে না।

তাঁর উক্ত মন্তব্য ২০০৩ সালের নাগরিকত্ব আইনের কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। সেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারীর পরে যারা বিনা পাসপোর্ট বা অন্য কোন বৈধ অনুমতি পত্র ছাড়া ভারতে এসে বসবাস করছে তারা অনুপ্রবেশকারী, ভারতীয় নাগরিকত্ব পাবার কোন অধিকার তাদের নেই। এর ফলে সমস্ত উদ্বাস্তু মানুষ, এবং ইতিপূর্বে যে সমস্ত মানুষ বসতি পেয়েছে, তারাও এই আইনের চোখে অনুপ্রবেশকারী,—যা বিস্ময়কর হলেও অস্বীকার করার উপায় নেই।

দিল্লী হাইকোর্টও কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশ কার্যকরী করার লক্ষ্যে দিল্লী, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, আসাম, ত্রিপুরা পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যের লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু মানুষকে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী বলে গ্রেপ্তার করে পুশব্যাক করার চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে তিন লক্ষ রেশন কার্ড ও ২৫ লক্ষ নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে সিংহভাগ বাংলাদেশী উদ্বাস্তু। বাংলাদেশীরা আইনের চোখে অনুপ্রবেশকারী, তাই তাদের রেশন কার্ড ও ভোটার তালিকায় নাম থাকতে পারে না। সুতরাং বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দাদা-দিদিরা যে যা-ই বলুন না কেন, যত আশ্বাস প্রতিশ্রুতি দিন না কেন, বাংলাদেশী উদ্বাস্তুরা যে এক ভয়াবহ, অন্ধকারময় ক্রান্তিকালের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে তা বলাই বাহুল্য। অবিলম্বে বাকি বাংলাদেশীদের রেশনকার্ড, ভোটার কার্ড সহ সমস্ত সরকারী নথীপত্র ছিনিয়ে নেওয়া হবে; এমন কি তাদের সমস্ত জমি-জায়গা, বাড়িঘর সরকার ক্রোক করে নেবে। সরকারী এই সিদ্ধান্তকে রোধ করার ক্ষমতা কোন রাজনৈতিক দাদা-দিদির নেই। সুতরাং সেই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরদের কথা শুনে আর নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। এবং আমরা যারা সেই পলিতকেশ ভদ্রলোকের মতো ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড অর্জন করে ভাবছি 'যমের দক্ষিণ দুয়ার' থেকে বহু যোজন দূরে আছি, নিরাপদ আছি, তাদের সেই ভাবনা মুর্খের ভাবনা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ যম তার দক্ষিণ দুয়ারে বসে, তার সুদীর্ঘ হাত প্রসারিত করে আমাদের কাঁধের ওপর রেখেছে; সে হাতে ঘাড় ধরে আমাদেরকে দুর্ভাগ্যের অন্ধকারে ঠেলে দিতে এতটুকু সময় নেবে না।

তাহলে আমরা কি শুধু অন্ধকারে যাবার জন্যই তৈরি থাকব? বাংলাদেশ আমাদের ভিটে ছাড়া করেছে, মা-বোন-জায়ার ইজ্জত নিয়েছে; ভাগ্যের ওপর দুর্ভাগ্যের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে,—আমরা কি আজীবন সেই বোঝা বহন করে চলব? আমাদের পর আমাদের উত্তরসূরীরা সেই বোঝা বয়ে বেড়াবে? এভাবে কি একটা জাতির জীবন চলে? না একটা জাতি বেঁচে থাকতে পারে না। প্রত্যেক জাতির বাঁচার জন্য চাই একটা দেশ। যে জাতির দেশ নেই, সে জাতি ভবিতব্যহীন। আর নিয়তিবিহীন জাতি কোন কালে পৃথিবীতে টিকে থাকতে পারে নি, আগামী দিন পারবেও না। তাহলে আমরা আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখব কি করে? আমাদের ভাববার সময় এসেছে। এখনো যদি আমরা চুপ করে বসে থাকি, অনিমীলিক চোখে নিদ্রায় মগ্ন থাকি, তাহলে যে সমস্যার শোণিত মারণ ব্যধির মতো আমাদের শরীরের শিরা উপশিরার ভেতর দিয়ে দ্রুত বেগে বয়ে চলেছে, সেই ব্যধি থেকে আমরা কোন দিন মুক্তি পাব না। সেই মুক্তিরপথ আমাদেরই বেছে নিতে হবে।

'নিখিলবঙ্গ নাগরিক সংঘ' সহ বিভিন্ন উদ্বাস্তু সংগঠন হতভাগ্য বাংলাদেশী উদ্বাস্তুদের বাঁচার জন্য আন্দোলন করছে। প্রত্যেক উদ্বাস্তু নাগরিক যারা ভারতের আইনের চোখে অনুপ্রবেশকারী, তাদের উচিত নিখিলবঙ্গ নাগরিক সংঘের আন্দোলনকে সমর্থন করা এবং সেই আন্দোলনে সামিল হওয়া। কারণ উক্ত সংগঠনই কেবল মাত্র সঠিক আন্দোলন করছে। ভারতের বুকে যারা অনুপ্রবেশকারী, এবং বাংলাদেশের বুকে যারা আজও ইসলামিক শাসনে জিম্মি, তাদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি। এই পাঁচ কোটি মানুষের একমাত্র বাঁচার উপায় এবং বাংলাদেশী উদ্বাস্তু স্রোতের চিরস্থায়ী সমাধানের জন্য প্রয়োজন একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র। যা নিখিলবঙ্গ নাগরিক সংঘের আন্দোলনের একটা প্রধান দিক। আমাদের সময় এসেছে ইহুদী জাতির মতো শপথ গ্রহণ করার। একদা, দেশহীন, রাষ্ট্রহীন লাঞ্ছিত ইহুদি জাতি সংকল্প করেছিল যতদিন তারা তাদের নিজস্ব স্বাধীন দেশ গঠন করতেন না পারছে ততদিন তারা আন্দোলন থেকে বিরত হবে না।

আমাদেরও তেমন সংকল্প গ্রহণ করতে হবে,—যতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশ ভাগ করে নির্যাতিত পাঁচ কোটি মানুষের জন্য স্বতন্ত্র বাসভূমি বা হোমল্যাণ্ড স্থাপন না হচ্ছে ততদিন আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। এবং সেই সঙ্গে এ আন্দোলনও করতে হবে, যতদিন স্বাধীন রাষ্ট্রগঠন না হচ্ছে ততদিন ভারতে বুকে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে আসা প্রত্যেক বাংলাদেশী শরণার্থীকে ভারতে বসবাসের অধিকার দিতে হবে। মাত্র ৬৫ লক্ষ ইহুদির জন্য একদা যদি ইজরায়েল রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে তবে কেন পাঁচকোটি হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টানদের স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হবে না? মনে রাখতে হবে ইহুদি জাতি তাদের দেশ ছেলের হাতের পিঠের মতো আপোষে পায়নি; নিজেদের বাঁচার জন্য বিশ্ব তোলপাড় করা এক ভয়ঙ্কর আন্দোলনের মাধ্যমে তারা তাদের দেশ ছিনিয়ে নিয়েছে। আমাদেরও তেমনি বিশ্ব উথালপাথাল করা আন্দোলনে ঢেউ তুলতে হবে, যে ঢেউয়ে বাংলাদেশের একটা অংশ ধ্বসিয়ে আনা যাবে। আর এটা করতে না পারলে পৃথিবীর বুকে স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে আমরা কোন দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব না। পরিবর্তে আমরা ক্রীতদাসে বা মেরুদণ্ডহীন মৃত জাতিতে পরিণত হব। তাই নিজেদের বাঁচতে, গোটা জাতিটাকে বাঁচাতে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সমস্ত হীনতা, জড়তা এবং ভয়কে জয় করে সমবেত কণ্ঠে আমাদের বলতে হবে ঃ

ভিটে মাটি হারা বঙ্গসন্তান ফিরিব আপন ঘরে। হারানো জীবন ফিরে পাব মোরা দাঁড়াবে উচ্চশিরে।

লগ অন করুন ঃ
nbns.yolasite.com
amardesh.tv
mayerdak.com

কবির কল্পনায় সবই সম্ভব হয়। / মদ্যপের কোন কথাই অসম্ভব নয়।।
মাংসভক্ষণ, সুরাপান, আর মূর্খজন। এই তিন শ্রেণী পশুতুল্য রূপে গণ্য হন।
মানুষের আকৃতি হলেও এরা পশুতুল্য। পৃথিবীর বোঝা এরা নেই কোন মূল্য।। —চাণক্য

প্রকাশক, মুদ্রক —সুভাষ চক্রবর্তী, ৮৫ এ পি সি রোড, কোলকাতা-৯, প্রধান কার্যালয় ঃ স্কুলপাড়া, শ্রীখণ্ড1, কোলকাতা - ১৫২ কর্তৃক প্রকাশিত
আনন্দ প্রিন্টার্স, ৩/১সি মোহনবাগান লেন কোলকাতা - ৪ হইতে মুদ্রিত
সত্ত্বাধিকারী ও সম্পাদক ঃ সুভাষ চক্রবর্তী, ফোন ঃ ৮৯৮১২৮৫৬০৭